মহাজাগতিক ছন্দ

বিপ্লব পাল

‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রীর’ একটি পর্যালোচনা এবং পদার্থবিদ্যার নবতম আবিষ্কারের কিছু গল্প

[অভিজিতের নতুন বই ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ সবেমাত্র শেষ করলাম। জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার এমন উত্তেজক গল্প বাংলা সাহিত্যে তো বটেই, ইংরাজী সাহিত্যেও বিরল। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিলো পাঠকদের এ ধরণের আরো কিছু গল্পো শোনালে কিন্তু মন্দ হয় না। তাই আমার এই লেখাটির সূচনা, যাতে পাঠকেরা অভিজিতের বইটি আরো ভালো করে বুঝতে পারে এবং উপভোগ করে।

‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ বইটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম থেকে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে পদার্থ বিদ্যার আদি ইতিহাস। নিউটন থেকে আইনস্টাইন। পদার্থবিদ্যার ছাত্র হিসাবে, এই ইতিহাসের উপর আমার নিজস্ব একটা মতামত আনেকদিন থেকেই তৈরী হয়ে আছে। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত নবতম মহাজাগতিক আবিষ্কারের উপর গল্পগুলো পাঠকদের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন বই আর ওয়েবসাইটের উপর নির্ভরশীল হয়েছি। সপ্তম অধ্যায়টি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় ধারণার উপর পদার্থবিদ্যার কুঠারাঘাত। শুধু এই অধ্যায়টিই একটি বইয়ের উপজীব্য হতে পারে।]

বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যখন ছন্দ জাগে।
-রবীন্দ্রনাথ

জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যঃ কেনো পড়ি, কেনোই বা পড়তে বলি!

কৈশোরে, মাসের শেষ শনিবারে সকাল থেকে তীর্থের কাকের মত প্রতীক্ষায় থাকতাম। কখন পেপারওয়ালা লেটেষ্ট কিশোরজ্ঞান বিজ্ঞান টা বারান্দায় ছুরে দেবে। সমরজিৎ কর, আবদুলাহ-আল-মুতি শরফুদ্দিন, সূর্যেন্দু বিকাশ করমহাপাত্র, জয়ন্ত বিষ্ণু নারালিকার- এরা ছিলেন আমার প্রিয় বিজ্ঞান লেখক। ছোট বেলায় বিগ-ব্যাং বা মহাজাগতিক বিস্ফোরনের সাথে পরিচয় সেই নারালিকারের লেখার সূত্র ধরে—যদিও নারালিকার নিজে কাজ করতেন বিগব্যাং নয় বরং তখনকার সময়ে তার ‘প্রতিপক্ষ’ স্থিতিশীল মহাজগৎ নিয়ে। স্থিতিশীল মডেল বিগ ব্যাং-এর ধারণা থেকে সৃষ্ট ক্রম বধর্মান মহাবিশ্ব মডেলের পরিপন্থী একটি ধারণা। কিন্ত তারপরও নারালিকার লিখতেন বিগ ব্যাং নিয়ে। বলতেন, এই কুসংস্কারের দেশে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা সব চেয়ে বড় বিজ্ঞান।

আমি তখন আআইটি র ছাত্র। আমার ক্লাসের বন্ধুরা (অধ্যাপক সৌগত বসু[লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়], অঃ

নীলিমা নিগম [ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়], ডঃ অনুপম মজুমদার [বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ]) তখন রজার পেনরোজ আর স্টীফেন হকিংসে মগ্ন। অনুপম তো স্টীফেন হকিংসের একটা নতুন পেপার না বুঝতে পারার যন্ত্রণায় আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিলো! এরকম বিজ্ঞান-মনস্ক পরিবেশে বেশ কিছু কাল কাটানোর ফলে, বাকী সমাজের বিজ্ঞান-মনস্কতা নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। আনাবাদি রইলো জীবনের অনেকখানি আবাদি জমি! পরবর্তীকালে সমাজের মূল স্রোতে ফেরার পর বুঝলাম, এই সমাজের (কি বাঙালী কি আমেরিকান) আধুনিকতা টিভি,ফ্রীজ আর ভোগবাদের জাঁতাকলে—এরা মাদুলীও পরবে আবার ছেলেকে এঞ্জীনিয়ারও বানাবে। বিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের কপিবুক রেবতী-বিজ্ঞানের পেপার ছাপে আবার 'বৌয়ের অনুরোধ' ফেলতে না পেরে, আঙ্গুলে পাথরও পরে! কেউ কেউ আবার ইদানিং গীতা বা কোরানে কোয়ন্টাম মেকানিক্সের সন্ধান করে চলেছেন!

এই সেই হতভাগ্য বাঙালী সমাজ! আমাদের এই অভাগা সমাজের কথা ভেবেই অভিজিৎ সাধারণ মানুষের জন্য বইটি লিখেছেন।

রাত্রে যখন মহাকাশের দিকে তাকায়, হাজারো তারারা জ্বলে ওঠে দিগন্ত থেকে দিগন্তে, সারাদিনের অহংবোধ—পাই পয়সার সংসারের মলিন মন বিলীন হয় মহাকাশের বিশালতায়। এই দিগন্ত হীন বিশালতায়, এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি, আরো ক্ষুদ্র মন প্রশ্ন করে—এই তারারা কারা? তাদের জন্ম হলো কি করে? তাদের কি মৃত্যু নেই? এই মহাসৃষ্টি কি করে সম্ভব হলো? এই মহাবিশ্বের কোনো শেষ বা শুরু আছে কি? এই তারারা চলমান নাকি স্থির?

এ সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে 'আলো হাতে ছলিয়াছে আঁধারের য়াত্রী'র চেয়ে ভালে বই বাংলা সাহিত্যে আর বেরোয় নি। কোনো কূইজের উত্তর নয়, অভিজিৎ আমাদের নিয়ে গেছেন আবিষ্কার আর বিজ্ঞান মননের গভীরতম প্রদেশে। সেই মন যে ব্যাপারে নিউটন বলেছিলেন —'আমি আসলে সাধারন মানুষের চেয়ে বেশীই দেখি—আমার আরেকটি অতিরিক্ত চোখ আছে, সেই চোখটি হলো আমার বিজ্ঞান-মনস্ক মন'।

[চলবে]